বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের স্থান ও দান

ড. রামপ্রসাদ বিশ্বাস

অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দের মধ্যে আঠারটি শক্তির ও গুণের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। সেই শক্তি কেশব সেনের মতো জগৎমান্য হবার মতো। ১৮৯৩ সালের ১১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরে মহাধর্ম সম্মেলনের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তার স্বীকৃতি পেয়ে গুরুদেবের বাক্যকে সত্যে ও বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছিলেন। যোগী, বাগ্মী, সমাজসেবী, সৎ, সাহসী, বিদ্বান বিবেকানন্দ ৩৯ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে অনেক জ্ঞান গর্ভ বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্যের বই পড়লেও পেশাদার সাহিতিকের মতো বই লেখার মতো অখন্ড অবসর ও স্থিরতা তিনি পাননি। গুরুর মাহাত্মা ব্যাখ্যা ও বেদান্তবাদ প্রচারের জন্য বক্তৃতা দিতে হয়েছিল, কিছু চিঠিও লিখতে হয়েছিল। কিছু বিষয় অনুবাদ, সংক্ষিপ্তসার, কিছু প্রবন্ধ রচনা কিছু কবিতাও লিখতে হয়েছিল।

সাহিত্য রচনার ক্ষমতা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পান। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত পেশায় আইনজীবী হলেও নেশায় ছিলেন সাহিত্যিক। এ বিষয়ে তাঁর গোপন সাধনা ছিল। তিনি 'সুলোচনা' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু জ্ঞাতি খুড়ো শ্রী গোপালচন্দ্র দত্তের নামে ছাপান ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে। বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত নব্বই (৯০) খানি গ্রন্থ রচনা করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা। সুতরাং বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র এবং এমনতর লেখক ভ্রাতাদের অগ্রজ অজ্ঞাত সারে বা আপন খেয়ালে বা একান্ত অবলীলায় সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হবেন, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে। আমেরিকা তাঁর নাম দিয়েছিল 'দি সাইক্লোনিক হিন্দু।' প্রকৃতপক্ষে এই বীর সন্ন্যাসী সারা পৃথিবীর মনীষীদের চিত্তজগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। নিজের অজ্ঞাতসারে এক মহান সাহিত্যের জন্ম দিয়ে গেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যাকে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য' বলেছেন। এ সাহিত্যের গুণমান বিচারের পূর্বেই এর পরিমাণ দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী' প্রকাশ করে উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা। ১০ খন্ডে সম্পূর্ণ। প্রতিখন্ড কমবেশি ৫০০ পৃষ্ঠার। তাঁর সব বাণী ও রচনা প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। তাঁর ইংরাজি রচনাগুলিও বাংলায় অনূদিত ও বহু পঠিত। অনেক ইংরাজি চিঠিও ভাষান্তরিত হয়েছে বাংলায়। সেগুলিও বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

আলোচনার সুবিধার্থে বিবেকানন্দ সাহিত্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১) ভ্রমণ সাহিত্য, ২) প্রবন্ধ সাহিত্য, ৩) কাব্য সাহিত্য, ৪) পত্র সাহিত্য, ৫) অনুবাদ ভিত্তিক ধর্ম সাহিত্য।

স্বামীজীর নিজের কথাতেই পাই তাঁর পায়ে 'চক্কর'। অর্থাৎ পায়ে তাঁর চাকা বাঁধা। প্রতি মুহূর্তে ছুটেছেন, বেড়িয়েছেন। বেড়ানো তাঁর কাছে বিলাসিতা ছিল না। দেশদুনিয়াকে হাতেকলমে জানব গোছের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিশ্বময় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। শুধু পরিব্রাজক নন, তিনি বিশ্ব পরিব্রাজক। তিনি অধিকাংশ মহাদেশ ছুঁয়েছেন। সব দেশের মানুষকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। দেশ-বিদেশের মানুষ, ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, রুচি, আচার, ধর্ম প্রবণতা কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এ পর্যায়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'পরিব্রাজক'। ভ্রমণ সূত্রে লেখা বলে একে ভ্রমণসাহিত্য বলা যেতে পারে। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে এর স্থান অনেক উঁচুতে।

১৮৯৯, ২০ জুন দ্বিতীয়বার তিনি পাশ্চাত্যে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ

এবং ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক তখন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। সম্পাদকের বিশেষ অনুরোধে বিবেকানন্দ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে পাঠান যা পত্রিকাতে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তকাকারে এগুলি বের হয়। তখন এর নাম হয় 'পরিব্রাজক'।

প্রথমবার (১৮৯৩) আমেরিকা যান–মুম্বই থেকে জাহাজে ওঠেন। প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে পৌঁছান গন্তব্যে। দ্বিতীয়বারে কলকাতা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু। মাদ্রাজ, কলম্বো, এডেন হয়ে ভূমধ্যসাগর। লন্ডনের মাটি স্পর্শ করে ৩১ জুলাই।

বিচিত্রপথের বিচিত্র বৃত্তান্ত। তাতে আছে বাংলার শোভা ও বাংলার রূপ; আছে বঙ্গোপসাগরের অশান্ত নীলাম্বুরাশির কাব্যিক বর্ণনা। জাহাজের ভিতরকার খবর। ভিতরে কোন প্রযুক্তিবিদ্যার জোরে বাষ্প পোত এত শক্তিশালী সেদিকটিও তুলে ধরেছেন। এসেছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত প্রসঙ্গ; বলেছেন দক্ষিণী সভ্যতার মৌলিকতার কথা। সিংহল নামকরণের ইতিহাস, বাঙালি বিজয় সিংহল কথা; বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের কথা এসব বলতে ভোলেননি। এডেনে যাবার আগে ভরা মনসুনের কথা লিখেছেন। রেড-সী প্রসঙ্গে প্রাচীন মিশরের কথা বলেছেন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সুয়েজখালে জাহাজ পৌঁছালে একটি হাঙ্গর শিকার করেছিল কিছুযাত্রী। এ বিষয়ে চমৎকার বর্ণনা আমরা পাই। ভূমধ্যসাগরে জাহাজ পড়ামাত্র তাঁর বর্ণনা একেবারে ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার দোষগুণ, ফ্রান্স ও জার্মানির তুলনামূলক আলোচনা এসেছে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির কথা, নেপোলিয়নবোনাপার্টের কথা, তুরস্কের শৌর্য ও ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন যা ইতিহাস সম্মত। কনস্ট্যান্টিনোপল দেখেছেন, এথেন্স, গ্রীসে বেড়িয়েছেন, দেখেছেন পারিলুভর মিউজিয়াম।

এখানে লেখকের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী, তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞান ও ইতিহাস পাঠের পরিধি অসীম। কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের কাহিনী যেন তাঁর নখ-দর্পণে। প্রজ্ঞার চিহ্ন রয়েছে ছত্রে ছত্রে। আবার কোথাও আছে ভবিষ্যৎ বাণী। 'পরিব্রাজক' পড়া মানে একজন তত্ত্বদর্শীর সঙ্গে কথা বলা, একজন হৃদয়বানের সঙ্গ করা, একজন মনীষীর সান্নিধ্য লাভ, একজন প্রথম শ্রেণির পর্যটকের সঙ্গে মানস ভ্রমণ।

জীবন রসিক লেখকের পরিহাস প্রিয়তার সঙ্গে মিশেছে উইট ও উজ্জ্বল মনীষা। ভাষা জীবন্ত ও ঘরোয়া। জাহাজের দুলুনিতে সী সিকনেসকে হাস্যরসিক শিরোমণি বিবেকানন্দ বলছেন এভাবে 'জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।'

তাঁর লিখনশৈলী তথা বর্ণনা শৈলী কখনো কখনো কাব্যের সীমানা দিয়ে চলে গেছে। তাঁর মধ্যে একজন বলিষ্ঠ রসোজ্জ্বল কবি-পুরুষ ছিলেন। 'সে জনস্রোত, সে রজগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘর্ষ, সে বিলাস ক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রো সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম – সেই হর, হর, হর, দেখতাম – সেই হিমালয় ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুর তরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন – 'হর্ হর্ হর্'!!

কখনো কখনো তাঁর কথনশৈলী ব্যাঙ্গাত্মক; বিদ্রূপের তীব্র কথাঘাত করেছেন উচ্চবর্ণের ডম্ফাইকে 'আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই করো, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ ? তোমরা হচ্চ হাজার বছরের মমি।'

বিবেকানন্দের পূর্বে (রচনাকালের দিক থেকে) তিনটি গ্রন্থ আমাদের চোখে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' (১২৮৭-৮৯) এবং রবীন্দ্রনাথের দুটি বই 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) এবং 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী' (১৮৯১-৯৬)। আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিতে বিচার করলে, বিষয় বৈচিত্রের পটভূমিতে রেখে দেখলে, উপস্থাপনের বলিষ্ঠতা ও ঋজুতার দিক থেকে দেখে একথা বলা যায় পূর্বোক্ত গ্রন্থ তিনটি কোনো দিক থেকেই পরিব্রাজকের সঙ্গে তুলনীয় নয়। বহু পাঠক এত বেশি উদ্দীপ্ত, সমৃদ্ধ ও উপকৃত হয়েছে যে 'পরিব্রাজক' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত।

প্রবন্ধ সাহিত্যের দুর্লভ মণি বা রত্নস্বরূপ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা'।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', একেবারে মৌলিক প্রবন্ধ। এটি ১৩০৬ থেকে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থাকারে বের হয়। গ্রন্থ নাম থেকেই বোঝা যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তুলনা এর বিষয়বস্তু। এই তুলনা করতে গিয়ে কোনো জাতিকে ছোট বা বড়ো করেননি। সকল জাতির অন্তর্নিহিত গুণাবলী বা প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। কোনো সংকীর্ণতা বা একদেশদর্শিতা নয়, বহুদর্শিতা ও ক্রান্তদর্শিতাই তার মধ্যে প্রকট। 'প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোনো গুণ নেই, যা কোনো জাতি শেষের একাধিকবার। তবে কোনো ব্যক্তি যেমন, কোনো জাতিতে কোনো কোনো গুণের আধিক্যপ্রাধান্য।' (পূর্ব-পশ্চিম পৃথিবীর মানুষের ধর্ম ও মোক্ষ নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভারত চায় মোক্ষ, পাশ্চাত্য চায় আভিচারিকধর্ম। জাতি বিশেষের প্রধান প্রবণতাগুলিও তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী চরিত্রের মেরুদন্ড। ইংরেজ চরিত্রের মূলে ভিত্তি ব্যবসাবুদ্ধি। ভারতীয় চরিত্রের মজ্জা মারমার্থিক স্বাধীনতা তথা মুক্তি – সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি – আত্মার মুক্তি। বিবেকানন্দের শরীর ও জাতি তত্ত্বে জ্ঞান দেখে আমরা বিস্মিত হই; পোশাক ও ফ্যাশন দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর চেতনা দেখে অবাক হই; আহার ও পানীয় বিষয়ে নানা জাতির নানা অভ্যাস বিষয়ে তাঁর অভিনিবেশ আমাদের ঋদ্ধ করে, পাঠকের জানার সীমানাকে প্রসারিত করে। ইউরোপের নবজাগরণ বিষয়ে বিবেকানন্দের আলোকপাত ঐতিহাসিকের মতো অভ্রান্ত। ইউরোপীয়ান ও আর্যদের মূল স্বভাব, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কয়েক সহস্র বছরের ইতিহাসের আলোয় বিচার করে তিনি ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন 'ইউরোপের উদ্দেশ্য – সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকব। আর্যদের উদ্দেশ্য – সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড়ে করব। ইওরোপের সভ্যতার উপায় তলোয়ার; আর্যদের উপায় বর্ণ বিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান – বর্ণ বিভাগ। ইওরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।'

'বর্তমান ভারত' প্রথমে উদ্বোধনে প্রবন্ধাকারে বের হয়। পরে প্রকাশিত হয় পুস্তকাকারে। বিবেক-মনীষীর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল এই প্রবন্ধ। এখানে ভারতের ইতিহাসের জটিল প্রশ্নগুলি উত্থাপিত। এটিতে নানা জাতিগত বৈশিষ্ট্য, দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রবণতাগুলিও বিধৃত। এখানে বিবেকানন্দের ভারতবোধ অতি উজ্জ্বলল রেখায় চিত্রিত। ভারতের প্রকৃত নেতৃত্বের ক্ষমতা শ্রেণিভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রে বর্তাবে। এই ভবিষ্যৎ বাণী। এই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে। তিনি এক মহান ভবিষ্যৎ বক্তা – 'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তি আধার প্রজাপুঞ্জি। যে নেতৃ সম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।'

সাধু ভাষায় লেখা প্রবন্ধটিতে সেকালে জটিলতার (ভাষাগত) অভিযোগ উঠেছিল।

ভাব অনুযায়ী ভাষা হওয়া দরকার। এত গভীর দর্শন ভাবনাগভীর ও ইতিহাস অন্বেষাপূর্ণ প্রবন্ধটির ভাষা যথোপযুক্ত শুধু নয়, তা অব্যর্থ ও শক্তিপ্রদ। 'স্বদেশমন্ত্র' – এই রচনাটি তামাম ভারতবাসীকে বিশেষত স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের নিকট ওংকার তুল্য হয়ে উঠেছিল – 'বলভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর ?

এই মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক, কাব্যরসাশ্রিত, সুরলালিত্যমাখা ধ্রুপদী উচ্চারণ এক উত্তম সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অহংকার ও অলংকার।

'ভাববার কথা' প্রবন্ধ সংকলনটি সবচেয়ে বেশি গবেষণা সম্ভব। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে, বক্তব্যের স্পষ্টতায়, ঋতুতায় এবং দূরদৃষ্টিপূর্ণ বক্তব্যে এটি জোরালো, ধারালো ও সারালো। এটি আসলে একটি চিঠি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা থেকে পাঠানো। প্রথমে উদ্বোধনে ছাপা হয়। পরে এই প্রবন্ধ সংকলনভুক্ত হয়। প্রবন্ধটির বাঙ্গালা ভাষা। এটি আদ্যন্ত চলিত ভাষায় লেখা এবং চলিত ভাষার পক্ষে জোরালো সওয়াল করে লেখা। চলিত ভাষার পক্ষে এতবড়ো দৃঢ় বক্তব্য বাংলা সাহিত্যে তখনো অশ্রুতপূর্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শনে, ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষা' সম্পর্কে প্রবন্ধে রায় দিয়েছেন 'সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃত বহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী।' তবু তিনি নিজে সরল ভাষায় লিখলেও 'প্রচলিত' (চলিত) ভাষায় কলম চালালেন না। টেকচাঁদী, হুতোমী ভাষাও চলিত ছিল কিন্তু উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আদর্শভাষা নয় – নক্‌শীর ভাষা। বিবেকানন্দের চেয়ে বয়সে দুবছরের বড়ো রবীন্দ্রনাথ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে চলিত ভাষা ব্যবহার করলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সবুজপত্র (প্রমথ চৌধুরীর) চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দেবার অঙ্গীকার করে। অথচ এর ১৪ বছর আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরে একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী যেন বাঙালী জাতিকে চলতি ভাষায় লিখতে আদেশ দিচ্ছেন উচ্চকণ্ঠে 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে।'

বঙ্গদেশের অঞ্চলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন চলিত ভাষা আছে, উপভাষা আছে, সেগুলো নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো জায়গা নেই। তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় সেই সমস্যার সমাধান দিয়েছেন প্রাকৃতিক নিয়মে সেটি বলবান হচ্ছে, এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ 'কলকেতার ভাষা'।

বিবেকানন্দের 'মনমুখ' এক ছিল। তাই নিজেও চলিত ভাষাতেই লিখে দেখিয়েছেন। 'বর্তমান ভারত' ও প্রথম দিকের কিছু চিঠিপত্র সাধুভাষায় লেখা। বাকি সবগুলিই চলিত ভাষায় লেখা। তাঁর ব্যক্তিত্বদীপ্ত ভাষার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় দীপ্ত হয়ে দেখা দেয় 'দুটো চলিত ভাষায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনাপরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘরদোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।'

বিবেক-বাণী সফল হয়েছে। কলকাতার ভাষা সব লেখক গ্রহণ করেছেন, চলিত ভাষাতেই সকল শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ লিখিত হচ্ছে। এই চলিত ভাষা আন্দালনের সার্থক পথিকৃৎ কোনো পেশাদার সাহিত্যরথী নন: এর প্রবর্ত্তক পুরুষ একজন বীরসন্ন্যাসী। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর

ভাব অনুযায়ী ভাষা হওয়া দরকার। এত গভীর দর্শন ভাবনাগভীর ও ইতিহাস অন্বেষাপূর্ণ প্রবন্ধটির ভাষা যথোপযুক্ত শুধু নয়, তা অব্যর্থ ও শক্তিপ্রদ। 'স্বদেশমন্ত্র' – এই রচনাটি তামাম ভারতবাসীকে বিশেষত স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের নিকট ওংকার তুল্য হয়ে উঠেছিল – 'বলভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর ?

এই মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক, কাব্যরসাশ্রিত, সুরলালিত্যমাখা ধ্রুপদী উচ্চারণ এক উত্তম সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অহংকার ও অলংকার।

'ভাববার কথা' প্রবন্ধ সংকলনটি সবচেয়ে বেশি গবেষণা সম্ভব। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে, বক্তব্যের স্পষ্টতায়, ঋতুতায় এবং দূরদৃষ্টিপূর্ণ বক্তব্যে এটি জোরালো, ধারালো ও সারালো। এটি আসলে একটি চিঠি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা থেকে পাঠানো। প্রথমে উদ্বোধনে ছাপা হয়। পরে এই প্রবন্ধ সংকলনভুক্ত হয়। প্রবন্ধটির বাঙ্গালা ভাষা। এটি আদ্যন্ত চলিত ভাষায় লেখা এবং চলিত ভাষার পক্ষে জোরালো সওয়াল করে লেখা। চলিত ভাষার পক্ষে এতবড়ো দৃঢ় বক্তব্য বাংলা সাহিত্যে তখনো অশ্রুতপূর্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শনে, ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষা' সম্পর্কে প্রবন্ধে রায় দিয়েছেন 'সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃত বহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী।' তবু তিনি নিজে সরল ভাষায় লিখলেও 'প্রচলিত' (চলিত) ভাষায় কলম চালালেন না। টেকচাঁদী, হুতোমী ভাষাও চলিত ছিল কিন্তু উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আদর্শভাষা নয় – নক্‌শীর ভাষা। বিবেকানন্দের চেয়ে বয়সে দুবছরের বড়ো রবীন্দ্রনাথ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে চলিত ভাষা ব্যবহার করলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সবুজপত্র (প্রমথ চৌধুরীর) চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দেবার অঙ্গীকার করে। অথচ এর ১৪ বছর আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরে একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী যেন বাঙালী জাতিকে চলতি ভাষায় লিখতে আদেশ দিচ্ছেন উচ্চকণ্ঠে 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে।'

বঙ্গদেশের অঞ্চলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন চলিত ভাষা আছে, উপভাষা আছে, সেগুলো নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো জায়গা নেই। তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় সেই সমস্যার সমাধান দিয়েছেন প্রাকৃতিক নিয়মে সেটি বলবান হচ্ছে, এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ 'কলকেতার ভাষা'।

বিবেকানন্দের 'মনমুখ' এক ছিল। তাই নিজেও চলিত ভাষাতেই লিখে দেখিয়েছেন। 'বর্তমান ভারত' ও প্রথম দিকের কিছু চিঠিপত্র সাধুভাষায় লেখা। বাকি সবগুলিই চলিত ভাষায় লেখা। তাঁর ব্যক্তিত্বদীপ্ত ভাষার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় দীপ্ত হয়ে দেখা দেয় 'দুটো চলিত ভাষায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনাপরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘরদোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।'

বিবেক-বাণী সফল হয়েছে। কলকাতার ভাষা সব লেখক গ্রহণ করেছেন, চলিত ভাষাতেই সকল শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ লিখিত হচ্ছে। এই চলিত ভাষা আন্দালনের সার্থক পথিকৃৎ কোনো পেশাদার সাহিত্যরথী নন: এর প্রবর্ত্তক পুরুষ একজন বীরসন্ন্যাসী। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর

মধ্যে আঠারোটি দুর্লভ গুণের সমাবেশ দেখতে পেয়েছিলেন দিব্যদৃষ্টিতে। বিবেকানন্দ নিজে মহাপ্রয়াণের দিকে স্বগতোক্তি করেছিলেন। এই বলে যে আরেকজন বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কী করে গেল। ঋষি অরবিন্দ বিবেকানন্দকে শিবের তৃতীয় নয়নের দীপ্তি কটাক্ষ বলে মন্তব্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য অমিত শক্তিধর বহুকর্মা আলোকসামান্য পুরুষের সামান্য একটু কটাক্ষ বাংলা সাহিত্যে পড়েছিল। সেই কটাক্ষ বাংলা সাহিত্যকে সৃষ্টিমান ও বীর্যবান এবং প্রাণবান করে তুলেছে।

কবি ঋষি। কবি ক্রান্তদর্শী। কবি স্বপ্নদর্শী। সেই অর্থে বিবেকানন্দ কবি। কবিতার মূল উদ্দেশ্য শুধু কাব্যবিলাস নয়, শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি নয়, ছন্দোচর্চা নয়। কাব্যের উদ্দেশ্য পাঠককে প্রাণিত করা। কবির ভাব বা ইচ্ছাকে বা বক্তব্যকে পাঠক শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত করা, পাঠককে উদ্দীপিত করা। এদিক দিয়ে বিবেকানন্দের কবিতা মহত্তর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

নির্দিষ্ট কোনো কাব্য তাঁর নেই। নানা সময়ে তাঁর চিত্র জাগ্রত ও উচ্ছ্বসিত হলে তা নানাধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই বাণীর অগ্নিতপ্ত লাভাস্রোত এক ক্ষুদ্র আগ্নেয় কাব্য-পর্বতের জন্ম দিয়েছে। কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি এগুলিকে একত্রিত করে নাম দিয়েছেন 'বীরবাণী'। এ কাব্য সব মিলিয়ে তিন ধারায় প্রবাহিত ১) সংস্কৃত স্তোত্র, ২) বাংলা কবিতা, ৩) ইংরাজি কবিতা যা পরবর্তীকালে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

তাঁর সংস্কৃত স্তোত্র তিন রকম। ১) শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রণি, ২) শিব স্তোত্রম, ৩) অম্বা-স্তোত্রম। রামকৃষ্ণ স্তোত্রের সংখ্যা চারটি। তার মধ্যে চতুর্থটির শেষ দুইচরণ বহুল প্রচারিত যা 'রামকৃষ্ণ প্রণাম' নামে খ্যাত।

'স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

ধর্মের সংস্থাপক, সকল ধর্মস্বরূপ, অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে রামকৃষ্ণ তোমাকে প্রণাম করি।

তিন নম্বর স্তোত্রে তিনি রামকৃষ্ণদেবকে 'নরদেব' বলে সম্বোধন করেছেন। শিবাবতার বিবেকানন্দ শিবস্তোত্র লিখবেন, মাতৃসাধক শক্তিসাধক বিবেকানন্দ অম্বা স্তোত্র রচনা করবেন। তাতে আর আশ্চর্য কী।

বেদের স্তোত্র যদি বৈদিক সাহিত্যের মর্যাদা পায় তাহলে বিবেক-রচিত গম্ভীর ভক্তি ভাবাপন্ন উচ্চাঙ্গের স্তোত্রগুলিও উন্নত কাব্যবিশেষ।

বাংলা কবিতার মধ্যে 'সখার প্রতি' প্রথম। এখানে ঈশ্বর-প্রেমের মহিমা এবং তার সর্বব্যাপকতার মাহাত্ম্য বিঘোষিত। শব্দবিন্যাস ধ্রুপদী, ভাবনায় গভীর ছন্দোবদ্ধ। এই রচনাটি অসম্ভব রকমের শক্তিমান এবং পাঠক হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। শেষ চার চারণে এটি অসামান্যতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরপ্রেমের ধারা মানবপ্রেমের সমুদ্রে এসে মিলেছে।

''ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।''

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটিতে শুধু 'মৃত্যুরূপা' কালী'র বন্দনা করেছেন ঠিকই। কিন্তু কর্মহীন মাতৃপূজা বিলাসিতার নামান্তর। স্বার্থপরতা বলি দিয়ে প্রবল জীবন সংগ্রামে ব্রতী না হলে মাতৃ-বন্দনা সার্থক হয় না। তাই কবির সিদ্ধান্ত কবির অটল বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা। চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধমান, হৃদয়-

শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।।

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' তাঁর সবচেয়ে দীর্ঘ কবিতা। ১৪৭ চরণে সম্পূর্ণ ওজস্বিতাপূর্ণ কবিতা। প্রবল বীর্য বাণীতে টগবগে তরতাজা কবিতা। সোহং তত্ত্ব এখানে তীক্ষ্ম তীব্রভাবে ব্যাখ্যাত ও কাব্যায়িত।

'মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর
গর্জে মেঘ অশনি নিনাদ'

বীরসন্ন্যাসীর কবিতার তাঁর বীর্যসত্তার অনুরূপ; তাই সার্থক।

'সাগর-বক্ষে' কবিতায় আকাশ ও সমুদ্রের সুন্দর বর্ণনা। ভারত চেতনা বিবেকানন্দের মনে খেলা করত, তাই তা অন্যের মনেও দোলা দিতে পারত। তাই ভারত প্রসঙ্গ তাঁর কবিতাতেও প্রবল অনুরাগের সঙ্গে সমুচ্চারিত হয় –

'শেষে সব আকাশে মিলায়।
নীচে সিন্ধু গায় নানা তান;
মহীয়ান সে নহে, ভারত!
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমরা;
রূপরাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন।'

তাঁর কবিতা সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু গুণমানে ও কার্যকারিতায় অসামান্য। সেকালের ও একালের বীররসপিপাসু ও কাব্যরসজ্ঞ দ্বারা ও তাঁর কবিতা পঠিত ও আলোচিত হয়। চিত্তজাগরণে ও জনজাগরণে তাঁর কবিতা এখনো প্রাসঙ্গিক। এটাই তাঁর, কাব্যের সার্থকতা। কবিতা ছাড়াও কয়েকটি গান লিখেছিলেন। 'রামকৃষ্ণ আরত্রিক ভজন', 'শিব সংগীত', 'শ্রীকৃষ্ণ সংগীত' প্রভৃতি বন্দনা গীতিগুলি উঁচুমানের কাব্যভাবনা সমন্বিত।

রসপূর্ণ হলে বা জ্ঞানযুক্ত হলে বা সুলিখিত হলে ব্যক্তিগত পত্রও সাহিত্য পদবাচ্য হয়। যার প্রচলিত নাম পত্রসাহিত্য। যেমন রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী অসামান্য সাহিত্য সম্পদ। পত্রলেখক যখন ব্যক্তিজীবনের বাইরের প্রসঙ্গে যান, দেশদুনিয়ার প্রসঙ্গে যান, বিচিত্র চিন্তাকে প্রকাশ করেন তখন তা আরো উন্নততর সাহিত্য হয়। বিবেকানন্দের জীবনে ব্যক্তিগত বলে কিছু ছিল না। একদিক থেকে তা রামকৃষ্ণগত, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনগত আর অন্যদিক থেকে তা ভারতগত, বিশ্বগত – একথায় সর্বগত। সেইজন্যে তাঁর পত্রাবলী সবচেয়ে উজ্জীবনী ও সঞ্জীবনী।

বিবেকানন্দের চিঠির প্রসঙ্গে একটি বিষয় – একটি কথা মনে রাখতে হবে। ১৮৮৮ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত এই চৌদ্দ বছরের চিঠি সংগৃহীত হয়েছে। তার আগে ২৫ বছরের জীবনের চিঠির খবর এখনো নেই। আর উক্ত ১৪ বছরের সব পত্রই যে উদ্ধৃত একথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত স্বামীজীর বাণী ও রচনা বইয়ে ৫৭৬টি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে। ১৫৩টি বাংলা, ৪১৮টি ইংরেজী, ৩টি সংস্কৃত, ২ খানি অনবদ্য ফরাসি। ইংরাজী 'দি কমপ্লিট ওয়ার্কস' গ্রন্থে ৭৭৭টি চিঠি ছাপানো হয়েছে। স্বামীজী প্রথম চিঠি লেখেন বৃন্দাবন থেকে। পত্রপ্রাপক প্রমদা মিত্র। তারিখ ১২ আগস্ট, ১৮৮৮। শেষ চিঠিটি ইংরাজীতে লেখা এতে তারিখ নেই, সাল আছে ১৯০২। নিউইয়র্ক থেকে লেখেন হ্যান্সবরোকে। অন্যান্য সাহিত্যের চেয়ে বিবেকানন্দের পত্রাবলী জাতিকে জাগ্রত করতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নিয়েছিল। তাঁর চিঠি নেতাজীর মনে দেশপ্রেমর ও আত্মত্যাগের আগুন জ্বালিয়ে 'আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। দ্বিতীয় চিঠি নেতাজীর মতো অগ্নিপুরুষকে উজ্জীবিত করতে পারে তার আকর্ষণীয়তা, উচ্চতা, গভীরতা ও কার্যকারিতা বিষয়ে বেশি বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন নেই।

বিবেকানন্দের অনুবাদভিত্তিক ধর্মসাহিত্য এবং বক্তৃতাভিত্তিক সাহিত্য পরিমাণে ও গুণমানে বিপুল ও বিস্ময়কর।

কর্মযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ ইংরাজিতে লেখা। পরে বাংলায় অনুদিত হয়। পাতঞ্জলী যোগসূত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি নিয়ে তাঁর প্রচুর লেখা আছে। বুদ্ধ, যীশুখ্রিষ্ট, হজরত মহম্মদ, রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলিও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

বিবেকানন্দের জীবন গল্পের মতো চমৎকার। জীবনে, একটি গল্প লেখার চেষ্টা করেছিলেন। সেটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় 'ভাববার কথা'য় ছাপা হয়েছে। এই অসমাপ্ত গল্পটির নাম 'শিবেরভূত'। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁর ঘরের কাগজ গুছাতে গিয়ে এই গল্পটি পাওয়া যায়।

এখন আমরা শুনবো বিবেকানন্দের মুখ নিঃসৃত বাণী। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণাটি এখানে সুব্যক্ত 'সুবাকু' যে কোনো প্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ করিলেও রচনা বিশেষ যদি সুরুচিসম্পন্ন এবং কোনো প্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয়, তাহা হইলে কখনো উহাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য শ্রেণিতে পরিগণিত করা যাইতে পারে না।

সাহিত্যতাত্ত্বিক হিসাবে বিবেকানন্দ সৌন্দর্যবাদী ছিলেন না, কল্যাণবাদী, প্রয়োজনবাদী, প্রয়োগবাদী। বঙ্কিমের নীতিবেত্তাভাবটি বাদ দিয়ে বিবেকানন্দ সাহিত্যকে কল্যাণের নিমিত্ত ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন।

বিবেকানন্দের সাহিত্যের প্রভাব বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে সুদূর প্রসারী। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করেও বিপুল জীবনীগ্রন্থ ও গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাংলা, ভারত তথা বিশ্বের সাহিত্যরথীদের মুখ থেকে বিবেকানন্দের সৃষ্ট সাহিত্যের উচ্চতা ও প্রভাবের কথা শুনব।

১) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে।'

২) 'বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনে গঠনকর্তা ... আজ সেই আদর্শ লইয়া ভারতবাসী জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছে।' এটা অরবিন্দের বক্তব্য।

৩) মহাত্মা গান্ধির বক্তব্যও শোনবার মতো 'তাঁর রচনাবলী আমি গভীর মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করেছি এবং সেগুলি পাঠ করার পর আমার মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা সহস্রগুণ বেড়ে গেছে।

৪) সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিলো আরো বেশি প্রাসঙ্গিক চরিত্র গঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।'

৫) পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ 'তিনি তাঁর বক্তৃতা ও রচনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার কতগুলো মূল বিষয় ও দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই তাঁর বাণী ও রচনা কখনো পুরনো হবার নয়।'

৬) রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক লিও টলস্টয় বিবেকানন্দ সাহিত্যের সমঝদার ছিলেন 'ঈশ্বর, আত্মা, মানুষ, ধর্মীয় ঐক্য ইত্যাদি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ বিস্ময়কর

প্রতিভার অধিকারী।'

৭) ফরাসী নোবেল লোরিয়েট লেখক রোমাঁ রঁলার মূল্যায়ন অসামান্য 'তাঁর কথাগুলি ছিল সঙ্গীতের মতো; বীঠোফেনের মতো সেগুলোর বাক্যাংশের বিন্যাস, আর হ্যান্ডেলের কোরাসের মতো প্রাণ মাতানো ছন্দ। ...যখনি আমি সেগুলো পড়ি, আমার সারা শরীর দিয়ে যেন চকিতে তড়িৎ স্পর্শের মতো শিহরণ বয়ে যায়।'

বিবেকানন্দ রোমান্টিক প্রেমের কবিতাকে 'পীরিতের কবিতা' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। নম্রধীর কবিদের চলাচলকেও আঘাত করেছেন। আসলে যে কোন দুর্বলতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে বাংলা কবিতার মধ্যে যে ওজস্বিতা এলো তা বিবেকানন্দের প্রভাবজাত। সাধারণ দরিদ্র মানুষকে, দুর্বল, নিম্নশ্রেণির মানুষকেও শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার যে দিকটিকে, বাংলা কবিতা গ্রহণ করলে, তাতে বিবেকানন্দ ... উপস্থিত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মেথর' কবিতা (কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি), নজরুলের 'কুলিমজুর' কবিতার মধ্যে বিবেকানন্দ-চেতনা ক্রিয়াশীল। মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় বীর্যরস, নজরুলের বিদ্রোহবাণীর ('বিদ্রোহী' কবিতা) যে ঝংকার তারমধ্যে বিবেকানন্দের সিংহনাদের প্রভাব আছে।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরার' অনেক বক্তব্য বিবেকানন্দ অনুসারী। বিশেষ তার থিম সেখানে ভারত। ভারত সম্পর্কের সন্ধানের দিক দিয়ে। ভারত চেতনার দিক দিয়ে গোরা চরিত্রের অনেক বক্তব্যই বিবেকানন্দীয়।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন আধ্যাত্মিকতাই ভারতের প্রাণ। সে কথা সত্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলী', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' এর মধ্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা নিহিত। 'গীতাঞ্জলী' যে নোবেল আনল তার মূলে ছিল এই ভারতীয় মিষ্টিসিজম ও অধ্যাত্মচেতনার বিশেষত্ব ও মৌলিকতা।

বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী পরিক্রমা করে আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। ভারতাত্মার বাণী মূর্তি, আধ্যাত্মিকতার প্রচারক জ্ঞান তাপস মহাযোগী বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে অসামান্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। চলিত ভাষার প্রচার ও প্রসারে, নিবীর্য বাংলা কবিতা ও সাহিত্যের মধ্যে তেজস্বিতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভৈরব নির্ঘোষ আমদানি করে সাহিত্য ক্ষেত্রেও এক নবযুগের সূচনা করেছেন। সেই অমিতশক্তিধর যুগ-পুরুষের ব্রহ্মশক্তি তরঙ্গ এখনো বাংলা বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যকে নব নব ভাবে উন্মেষিত, আন্দোলিত, প্লাবিত, পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ করছে এবং আগামী দিনেও তাঁর তূর্যনিনাদ থামবার নয়। তা কালের বীণায় অনাহত ধ্বনির মতো চিরদিন বাজতে থাকবে।